ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক :

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জন্মলগ্ন থেকেই বিরোধের সূত্রপাত হয়। দেশ বিভাজনের বিনিময়ে নবজাত এই প্রতিবেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবর্তে বৈরিতাই পেয়ে আসছে। স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাশ্মীর ভূখণ্ডে পাকিস্তানি হানাদারি দিয়ে এই বৈরিতাপূর্ণ মনোভাবের সূত্রপাত ঘটে যা পাঁচদশক পরে কার্গিল যুদ্ধেও সমাপ্ত হয়নি। ভারতের আয়তন ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি পাকিস্তানকে আতঙ্কিত করে তোলে। শক্তির নিরিখে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতকে মোকাবিলা করা কোনওদিন সম্ভব ছিল না। তাই ভারতকে মোকাবিলা করার জন্য পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই অন্যান্য বহিরাগত শক্তির সাহায্যের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন পর্যায়ে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করেছে যা পাকিস্তানের ভারত বিরোধিতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল। ভারত-চীন বিরোধের সুযোগ সদ্ব্যবহার করে পাকিস্তান চীনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে। পাকিস্তান ও চীন উভয়েরই অন্যতম উদ্দেশ্য হল ভারতের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে খর্ব করা এবং তা

Scanned with CamScanner

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাতে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। এটা লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন বহিরাগত শক্তি পাকিস্তানকে সাহায্য করছে তাদের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য। পাকিস্তানের এই প্রয়াসকে মোকাবিলার জন্য ভারতও অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হল পূর্বতর সোভিয়েত ইউনিয়ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মতো শক্তির ভূমিকা ও হস্তক্ষেপ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করতে সাহায্য করে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বিরোধ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এবং প্রধান হল কাশ্মীর। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজার অনুরোধেই ভারত কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে সম্মত হয় পাকিস্তান থেকে আগত হানাদারদের আক্রমণ সামাল দিতে। কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর প্রবেশকে বৈধ করতে কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং কাশ্মীরের ভারতভূক্তি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানি হানাদারদের বিতাড়ন যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে তখন আকস্মিকভাবে নেহেরুর নির্দেশে কাশ্মীরে পাকিস্তানি আক্রমণের বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপিত হয় এবং সেখানে স্থির হয় সমগ্র কাশ্মীর ভূখণ্ড বিদেশি সেনামুক্ত হলেই সেখানে একটি গণভোটের মাধ্যমে ঐ রাজ্যের ভবিষ্যৎ স্থির হবে। কাশ্মীরের বৈধ ভারতভূক্তির পরেও এমন একটি সিদ্ধান্তে রাজি হওয়ার প্রয়োজন ছিল কি না তা বিতর্কের বিষয়। সম্ভবত নেহেরুর প্রত্যাশা ছিল যে এভাবেই পাক-অধিকৃত কাশ্মীর মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু পশ্চিমি শক্তিগোষ্ঠীর মদতপুষ্ট হয়ে পাকিস্তান দখলীকৃত কাশ্মীরে তার শাসন কায়েম করে রাখল এবং গণভোট দিয়ে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের দিকে টেনে আনার একটা আশা পোষণ করতে শুরু করল। অর্থাৎ গণভোটকে প্রভাবিত করে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ করার কৌশল পাকিস্তান অবলম্বন করল। এরই সঙ্গে পাকিস্তান এই বাণী প্রচার করতে শুরু করল যেহেতু দেশ বিভাজন ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে এবং কাশ্মীর একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠরাজ্য, তাই কাশ্মীরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি যুক্তিসম্মত ও বৈধ। এরপর থেকে পাকিস্তানের প্রতি এবং বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যার প্রতি ভারতের মনোভাবও অনড় ও অনমনীয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাশ্মীর বিষয়টিকে উত্থাপন করে কূটনৈতিক সমর্থন যোগাড় করার কৌশলও পাকিস্তান শুরু করে।

সামরিক শক্তিবলে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতকে মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য ছিল। সেই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে পাকিস্তান বরাবরই উদ্‌গ্রীব ছিল। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদান করেছিল শুধুমাত্র কমিউনিস্ট শক্তির আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে। পাকিস্তান শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই ১৯৫৪ সালের দক্ষিণপূর্ব এশিয়া চুক্তি সংগঠন (South-East Asia Treaty Organisation) এবং ১৯৫৫ বাগ্‌দাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধ বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তান শুরু করে এবং সামরিকভাবে পরাস্ত হয় ভারতের কাছে। ১৯৭১ সালের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে ভারতের অভূতপূর্ব সামরিক সাফল্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধে ভারতকে আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রণতরীকে

Scanned with CamScanner

(Seventh Fleet) বঙ্গোপসাগরে প্রেরন করে। চীনও ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য স্থাপন করে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে আনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দাসূচক প্রস্তাবকে ভিটো করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিমলা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালে। এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো। সিমলা চুক্তিতে দুই দেশের মধ্যে সার্বভৌম অখণ্ডতা বজায় রাখা, যুদ্ধোত্তর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (Line of Control) লঙঘন না করা বা কোনওভাবে একক প্রয়াসে পরিবর্তন না করা এবং ভবিষ্যতে যাবতীয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা কেবলমাত্র দ্বি-পাক্ষিক স্তরেই আবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই সিমলা-চুক্তির বিভিন্ন শর্তকে পাকিস্তান নানা সময় ভঙ্গ করেছে যার সাম্প্রতিক প্রমান হল কার্গিল যুদ্ধ।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পর পাকিস্তান অনুধাবন করতে পারে যে, একক ভাবে সামরিক শক্তির আধারে ভারতকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। এরপর ভারতকে প্রত্যাঘাত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে মদত দিতে শুরু করে। প্রথমে ভারতের পাঞ্জাবে ও পরে জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তান ছায়া যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে। এই বিষয়ে প্রাক্তন পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি জিউল হক্ প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে বিপুল সামরিক সাহায্য প্রদান করে এই সোভিয়েত আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য। সোভিয়েত লাল বাহিনীকে নিধনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সম্মিলিতভাবে মুসলিম কট্টরপন্থী মুজাহিদিনদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলে। ১৯৮৮ আফগানিস্তান থেকে লাল বাহিনীর প্রত্যাহারের পর এই সমস্ত মুজাহিদিনদের পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে ব্যবহার করে। প্রায় দুই দশক ধরে কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তান বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করছে এবং কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিকীকরণ করার প্রচেষ্টা করছে।

১৯৯৮ সালে ভারত দ্বিতীয়বার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। পাকিস্তানও অল্প কিছুদিনের মধ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে এবং কার্গিল যুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 'লাহোর শান্তি প্রক্রিয়ার' পরে পাকিস্তান পরিকল্পিত ভাবে কার্গিল যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে এবং তার মধ্য দিয়ে চিরাচরিত ভারতের প্রতি বিরোধিতা ও বৈরিতাপূর্ণ মনোভাবকে পুনরায় প্রমাণ করে। এর পরে ২০০১ সালে 'আগ্রা সম্মেলন' ব্যর্থ হয় দুই দেশের কাশ্মীর সম্পর্কে অনড় মনোভাবের ফলে।

বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক ধরনের 'ঠাণ্ডা শান্তির' পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে উভয় দেশের তরফ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এই শান্তির বাতাবরণ বজায় রাখার জন্য। অর্থনৈতিক সম্পর্ককেও শক্তিশালি করার কথা হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে দিল্লি লাহোর বাসের পর ২০০৫ সালে কাশ্মীর উপত্যকায় শ্রীনগর ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফ্‌রাবাদের মধ্যে বাস পরিষেবা শুরু হয়েছে।

Scanned with CamScanner

ভারতের রাজস্থানের মুনাবাওয়ের সঙ্গে পাকিস্তানের সিন্দ (Sind) অঞ্চলের খোক্ রাপারের মধ্যে রেল পরিষেবাও ২০০৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে। তবে দুই দেশের মধ্যে এইসব আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণের ফলে এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রের খবর অনুযায়ী পাকিস্তান এখনও সীমান্ত পারাপারের সন্ত্রাসকে সমর্থন ও মদত যোগাচ্ছে। বিভিন্ন ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন (লস্করই তইবা, জয়েশী মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদীন)এখনো পাকিস্তানের মাটি থেকে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ২৬শে নভেম্বর ২০০৮ সালে মুম্বাইতে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট লস্করই তইবার সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরে উভয় দেশের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্তমানে কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। বর্তমানে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটলেও দুই দেশের মধ্যে একে অপরের প্রতি গভীর অবিশ্বাস রয়েছে। এই অবিশ্বাস ও নেতিবাচক মনোভাব এতটাই গভীর যে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হলেও এর পরিবর্তন হবে কি না সন্দেহ। এরফলে বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে বিদেশ সচিব ও বিদেশ মন্ত্রী পর্যায়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে গভীর সন্দেহ রয়েছে। তবে ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি কতদিন বজায় থাকবে তা অনেকটাই নির্ভর করছে এই দুই দেশের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার উপর।

Scanned with CamScanner